জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১০, সংখ্যা-২, জুলাই–ডিসেম্বর ২০২০

সতীনাথ ভাদুড়ীর *জাগরী* : রাজনীতির অন্দর-বাহির

মাখন চন্দ্র রায়*

Abstract

Satinath Vaduri (1906-1965) is a politics-conscious writer. Political ideology of Mahtma Gandhi, internal conflict in congress, emersion of socialist party, doctrine of communist party, 1942's 'quit India' movement are majorly displayed in his first novel *Jagori* (1945). The crisis figured based on contemporary political background, in that vortex frictions among ideas and humaniy of characters presented a hectic period. According to his own political experiences and point of view writter detected the political influences on Indian rural people. Events of Indian political history enormously evolute the cognition of general people. Conflicts of political views among four members of a family in greater Bihar is presented in *Jagori*. Intention of this article is to search the political influences and concussions in personal life through socio-economic inevitableness.

সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫) একজন রাজনীতি সচেতন কথাশিল্পী। আজীবন বিহারের পূর্ণিয়াবাসী এই লেখকের সাহিত্যে বাণীরূপ পেয়েছে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ। বঞ্চিত, অবজ্ঞাত ও প্রান্তিক জনপদের জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতার চিত্র-রূপায়ণে তিনি ছিলেন ঐকান্তিক। তাঁর প্রথম উপন্যাস *জাগরী*তে (১৯৪৫) গান্ধীবাদী রাজনীতি, ত্রিশের দশকে কংগ্রেসের অন্তর্বিরোধ, সোস্যালিস্ট পার্টির উদ্ভব, কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শ, ৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি প্রাধান্য পেয়েছে। সমকালীন রাজনীতির প্রেক্ষাপটে *জাগরী*তে যে সঙ্কট মূর্ত হয়ে উঠেছে, তারই আবর্তে চরিত্রগুলি মতাদর্শ ও মনুষ্যত্বের টানাপড়েনে ইতিহাসের এক অস্থির সময়কে ব্যক্ত করেছে। স্বীয় রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও জীবনদৃষ্টির গভীরতার সমন্বয়ে লেখক ভারতবর্ষীয় জনজীবনে রাজনীতির প্রভাবকে চিহ্নিত করেছেন। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ বিপুলভাবে সাধারণ মানুষের চেতনাকে বিবর্তিত করেছে। বৃহত্তর বিহারের এ রকম একটি পরিবারের চারজন সদস্যের রাজনৈতিক চিন্তাধারার পারস্পরিক দ্বন্দ্বই পরিস্ফুট হয়েছে *জাগরী*তে। সমকালীন আর্থ-সামাজিক অনিবার্যতায় ব্যক্তিজীবনে রাজনৈতিক প্রভাব ও প্রতিঘাতের স্বরূপ এই উপন্যাসটিতে বাস্তবানুগভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর *জাগরী* (১৯৪৫) বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র-পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রথম উপন্যাস। *জাগরী*র পটভূমি ১৯৪২ সালের অগ্নিগর্ভ ভারতবর্ষ। মহাত্মা গান্ধীর ঐতিহাসিক 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' ভাষণের আহ্বানে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল অগণিত মুক্তিকামী মানুষ। আগস্ট আন্দোলনের পূর্বে বঙ্গভঙ্গ, বয়কট, রুশ বিপ্লব, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, খিলাফত আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলনসহ ইতিহাসে ঘটে যায় নানা ঘটনা। '১৯৪২ সালে আন্দোলন তীব্রতর হয়ে ওঠে। আগস্ট মাসে একের পর এক বিশৃঙ্খল ঘটনা ঘটতে থাকে। বিহার ও উত্তর-প্রদেশের অনেক অঞ্চলে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন সহিংস আকার ধারণ করে। ৯ আগস্ট ভোরে মহাত্মা গান্ধীসহ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হওয়ায় ক্রোধে উন্মত্ত জনতা আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।'[১] ফলে নাশকতা ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র ভারতে। বোম্বাই থেকে উত্তর-প্রদেশ এবং বিহার থেকে বাংলা ও উড়িষ্যার গ্রামাঞ্চলেও এই আন্দোলন বিস্তৃতি পায়। মহাত্মা গান্ধীর কংগ্রেসের ভেতর কংগ্রেস সোস্যালিস্ট, ফরোয়ার্ড ব্লকসহ স্থানীয় নেতৃত্বনির্ভর উপদলসমূহ বিচ্ছিন্নভাবে এই আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ করে। ৯ আগস্টের পর থেকে যোগাযোগ ব্যবস্থা তথা রাষ্ট্রশক্তির ওপর তীব্র আক্রমণ

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

নেমে আসে। ডাকঘর-থানা-রেজেস্ট্রি অফিস-রেল স্টেশন দখল, ক্ষতিসাধন ও অগ্নিসংযোগ করে উন্মত্ত জনতা। *জাগরী* উপন্যাসে নীলুর আত্মকথনে স্মৃতির সরণি বেয়ে ভেসে ওঠে জনতার উন্মাদনার ছবি :

> এক বৈদ্যুতিক শক্তি সহসা দেশসুদ্ধ লোককে উদ্‌ভ্রান্ত ও দিশেহারা করিয়া দিয়াছে। যেখানে যাও, মনে হইতেছে যেন পাগলাগারদের ফটক খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিক্ষুব্ধ অথচ নেশাগ্রস্ত জনতা, কী করিবে ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছে না। মাইলের পর মাইল রেল লাইন তুলিয়া ফেলিয়াছে– লোহার রেল লাইন, ভারী ভারী রেলওয়ে স্লিপার, আর কত জিনিস, দূরের নদীতে গিয়া ফেলিয়া আসিতেছে। টেলিগ্রামের তার কাটা, পোস্ট অফিস ও মদের দোকান জ্বালানোর ভার গ্রামের বালকদের উপর। বয়স্ক লোকে ঐ সব তুচ্ছ কাজ করিয়া নিজেদের হাত গন্ধ করিতে চায় না।... বড়রা চায় নতুন কার্যক্রম।... রেল স্টেশন, খাসমহল কাছারি, সাবরেজিস্ট্রি অফিস ও থানার পর্ব শেষ হইয়া গিয়াছে।... যেখানেই তাহারা দল বাঁধিয়া যাইতেছে, সেখানেই তাহাদের সম্মুখে শক্তির স্তম্ভগুলি ভূমিস্যাৎ হইয়া যাইতেছে ও অত্যাচারের প্রতীকগুলি মাথা নত করিয়া লইতেছে।[২]

উন্মত্ত জনতার বিধ্বংসী রূপের এই রেখাচিত্র লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের স্রোতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন পর্বটি মতবাদের বহুত্ব ও পরস্পরের বিরোধিতায় আকীর্ণ। জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতাযুদ্ধ এবং আন্তর্জাতিক স্তরে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই যুগপৎ চালানো যাচ্ছিল না। উদ্ভূত পরিস্থিতি ভারতীয় সাম্যবাদীদের তখন জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসের বিপরীতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। ইতিহাসবিদ অমলেশ ত্রিপাঠী তাঁর *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস* গ্রন্থে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন– 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের বিরোধিতা করে কমিউনিস্ট দল। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে তাদের সহযোগ এমনকি আত্মগোপনকারী কংগ্রেস কর্মীদের খবর গোয়েন্দা দফতরের হাতে তুলে দেবার অভিযোগও তাদের বিরুদ্ধে পাওয়া যায়।'[৩] এই রাজনৈতিক মতাদর্শজনিত সংঘাতের কথা বিবৃত হয়েছে *জাগরী*র আখ্যানে। সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন *জাগরী*র লেখক স্বয়ং। ফলে সতীনাথ ভাদুড়ীর ব্যক্তি-জীবনের আস্বাদ পাওয়া যায় আলোচ্য উপন্যাসে। *জাগরী*তে বাবা প্রবলভাবে গান্ধীবাদী, বড় ছেলে বিলু কংগ্রেস সোস্যালিস্ট সমর্থক আর ছোট ছেলে নীলু কমিউনিস্ট। নীলুর দেয়া সাক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিলুর ফাঁসির আদেশ হয়। ফাঁসির আগের দিন রাত্রে দুশ্চিন্তার আবর্তে ঘুরপাক খেতে খেতে খুলে যায় পরিবারের চার সদস্যের অন্তর্লোকের আবরণ। চারটি চরিত্রই নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে সমসাময়িক রাজনৈতিক আন্দোলনের মূল্যায়ন করে। পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক বিশ্বাস ক্রমশ অনাবৃত করেছে চরিত্রগুলির অন্তর্লোক। রাজনীতি এ উপন্যাসের পশ্চাদ্‌পট গড়ে তুলেছে। আগস্ট আন্দোলনের যে তথ্য এই উপন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে তাও ইতিহাসসম্মত। একটি রাজনৈতিক সংকটকে কেন্দ্র করে একটি পরিবারের চারজন সদস্যের অন্তর্লোকের বিচিত্র সব অনুভূতির শিল্পরূপায়ণ *জাগরী*। রাজনীতি এই ব্যক্তিবর্গের পূর্ণাবয়ব নির্মাণের অনুঘটকমাত্র। গোপাল হালদারের মতে, 'সতীনাথ শুধু রাজনৈতিক উপন্যাসকার ছিলেন না, যে মহত্তর জীবনবোধ রাজনীতিকেও অতিক্রম করে যায় তিনি ছিলেন তার সন্ধানী।'[৪] লেখক সতীনাথ ভাদুড়ী পরিণত বয়সে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে আসেন। ওকালতি ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে হয়ে ওঠেন জাতীয় কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী। তারপর ১৯৪০ থেকে ১৯৪৪ সালের মধ্যে তিনবার কারারুদ্ধ হন। গোয়েন্দা বিভাগ কর্তৃক চিহ্নিত বিপজ্জনক বন্দি সতীনাথের দীর্ঘ কারাজীবনে লিখিত *জাগরী* উপন্যাসটি তাঁর প্রথম উপন্যাস। বিলু যে ফাঁসি সেলে বসে কারাগারে অনুপুঙ্খ বর্ণনা দেয় তা শুধু এক কারারুদ্ধ ব্যক্তির দিনপঞ্জি নয়, তাতে মিশে আছে সতীনাথ ভাদুড়ীর ব্যক্তি-জীবনের উত্তাপ ও ছায়া।

সতীনাথ ভাদুড়ীর *জাগরী* উপন্যাসে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিবেশ বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলির ভিন্ন মতাদর্শ প্রাদেশিক ও জাতীয় রাজনীতিকে জটিল করে তুলেছিল। এই জটিল আবর্তের মধ্যে থেকে লেখক অবলোকন করেছেন পরাধীন ভারতবাসীর উপর ইংরেজদের অত্যাচার। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন দুই বিশ্বযুদ্ধের যাঁতাকলে মরণাপন্ন মানুষের অসহায় অবস্থা। বিশ শতকের চারের

দশকে সংঘটিত অসহযোগ আন্দোলনে রাজনৈতিক কর্মীদের ভিন্ন অবস্থান, পুলিশের অত্যাচারে জেলবন্দি মানুষের করুণ পরিণতি, অপর দিকে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কংগ্রেস কর্মীদের স্বার্থ সিদ্ধি– সবই ছিল তাঁর নখদর্পণে। এক সময় কংগ্রেস ছেড়ে সোস্যালিস্ট পার্টিতে যোগ দিলেও কৃষক-শ্রমিকদের নামে জমিদারদের স্বার্থ সিদ্ধির ঘটনায় হতাশাগ্রস্ত হয়ে তিনি ঐ দল থেকে সরে যান। যদিও কমিউনিস্টদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে অসহযোগ আন্দোলনে তাদের স্বদেশবিরোধী কর্মসূচিতে তিনি মর্মাহত হয়েছিলেন। সব মিলিয়ে সতীনাথ ভাদুড়ী অখ্যাতনামা দেশপ্রেমীদের উদ্দেশ্যে চারের দশকের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাপুষ্ট *জাগরী* উপন্যাসটি উৎসর্গ করেছেন। এই উপন্যাসে রাজনৈতিক ঘটনা ও মতাদর্শের প্রতি আনুগত্য ও বিরোধ দুই-ই স্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়েছে। উপন্যাসটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমালোচক গোপাল হালদার *জাগরী*কে 'রাজনৈতিক উপন্যাস' বলে অভিনন্দিত করেন :

> অনেক আশা নিয়ে আমরা অভিনন্দন করছি 'জাগরী'র লেখককে, কারণ আমরা রাজনৈতিক উপন্যাসের ভবিষ্যতে বিশ্বাসী। এদিকে 'জাগরী' এক সমুজ্জ্বল স্বাক্ষর। জেলখানার রাজনৈতিক ওয়ার্ডের দেখা রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক মানুষদের এমন চমৎকার চিত্র আর বাংলা সাহিত্যে কেউ আঁকেন নি, এ কথা আগে বলেছি। তার থেকে সত্য কথা– কংগ্রেস জীবনের একটি সার্থক চিত্র আমরা বাংলা কথাসাহিত্যে পেলাম; পেলাম সার্থক কয়েকটি রাজনৈতিক টাইপ ও মানুষ।[৫]

জাগরী উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে তাদের নিজ নিজ দলের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখাতে চেয়েছেন সতীনাথ ভাদুড়ী। ঔপন্যাসিক যেন চারটি ব্যক্তিসত্তায় নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে ভারতবর্ষের রাজনীতির ভবিষ্যৎ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছেন। দেখতে চেয়েছেন সমকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সত্তার সত্যসন্ধানের পথ। অবশ্য তা তিনি দেখিয়েছেন তাঁর ব্যক্তিগত সামাজিক-রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষতায়, তৎকালীন রাষ্ট্রীয় শক্তির সঙ্গে সামজিক শক্তির সংঘাত ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বীক্ষণে, মানবিক মূল্যবোধের পর্যালোচনা ও আত্ম-সমালোচনার মধ্য দিয়ে। উপন্যাসটির এই সার্থকতার সূত্রে স্মরণীয় যে, *জাগরী*র ছত্রে ছত্রে নিহিত রয়েছে লেখকের অকৃত্রিম প্রেরণা ও তাঁর আন্তরিকতা।

জাগরী একটি পরিবারের চারজনের জীবনের আদ্যপান্ত কাহিনি নয়, এক রাতে পরিবারের চারজনের বিচ্ছিন্নভাবে বিনিদ্র রজনী যাপনের কাহিনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন উত্তপ্ত ভারতবর্ষে দেশীয় রাজনৈতিক চেতনা অনেকগুলো শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর মধ্যে প্রধান ছিল গান্ধীবাদী অহিংস আদর্শ, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির হিংসাত্মক জাতীয়তাবাদী আবেগ এবং কমিউনিস্টদের ফ্যাসিস্টবিরোধী জনযুদ্ধনীতি। *জাগরী* উপন্যাসে এই মতসমূহ একটি 'রাষ্ট্রীয় পরিবারে' সংহত হয়ে সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চেতনার সংক্ষোভ, পরস্পরের প্রতি অসহিষ্ণু আত্মধ্বংসী অনিশ্চয়তায় পর্যবসিত হয়েছে। বিলুর পরিবারের মতো এমন কতো পরিবার, কতো তরুণের স্বপ্ন ধ্বস্ত হয়ে গেছে এই অনিশ্চিত কালবেলায়। উপন্যাসের ভাবনাপ্রবাহে কংগ্রেসে ধনী সম্প্রদায়ের আধিপত্য, কংগ্রেসী রাজবন্দিদের অলস-অমার্জিত, শিক্ষাবিমুখ ও সুযোগসন্ধানী মনোবৃত্তির বিশ্লেষণ রয়েছে। 'আওরৎ কিতা' অংশে মায়ের স্বগত বিবৃতিতে গান্ধী সম্পর্কিত বিরূপতায় সমগ্র ভারতে মহাত্মা গান্ধী বিষয়ে সাধারণ মানুষের মোহভঙ্গের বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। *জাগরী* উপন্যাসের ভূমিকা অংশে সতীনাথ ভাদুড়ী পাঠকদের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেছেন :

> রাজনৈতিক জাগৃতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। এই আলোড়নের তরঙ্গ-বিক্ষোভ কোনো কোনো স্থলে পারিবারিক জীবনের ভিত্তিকেও আঘাত করিতেছে। এইরূপ একটি পারিবারিক কাহিনী।
>
> গল্পটি ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিকায় পড়িতে হইবে।[৬]

সতীনাথ ভাদুড়ীর *জাগরী* বাস্তবিকই মানুষের শুভ চৈতন্যবোধ জাগরণের কাহিনি। 'জাগরী' হচ্ছে সেই বিনিদ্র প্রহরযাপনকারী, যে জাগিয়ে রাখে বা গভীর অন্ধকার থেকে আলোয় ফিরিয়ে আনতে চায়।[৭] জেলের পরিবেশে একটি রাজনৈতিক পরিবার বিগত জীবনের স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে আত্মসমীক্ষা ও আত্মজিজ্ঞাসায় মগ্ন হয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই উপন্যাসটির বিষয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি রাজনৈতিক চেতনা; যে চেতনা এক বৃহত্তর জাগরণের চেতনা। পরাধীন ভারতবর্ষ জেগে উঠবে– সেই বৃহত্তর জাগরণের কাহিনিই *জাগরী*। *জাগরী* উপন্যাসে যুগপৎ ব্যক্তির রাজনৈতিক ও আত্মিক জাগরণ পরিলক্ষিত হয়। *জাগরী*র আখ্যানভাগে রয়েছে ১৯৪২-এর এক রাত্রির কথা। রাত পোহালেই ফাঁসি হবে পূর্ণিয়া জেলে বন্দি আগস্ট আন্দোলনের বিদ্রোহী নেতা বিলুর। একই কারাগারে বন্দী বিলুর বাবা– যিনি স্কুলের শিক্ষকতা ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী স্বামীর অনুগামিনী হয়ে আশ্রমের দায়িত্ব পালন করে এখন কারাবন্দিনী। পরবর্তীকালে বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে বড় ভাই বিলু কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির সভ্য হয়ে আগস্ট আন্দোলনের বিদ্রোহী হয়, আর ছোট ভাই নীলু যোগ দেয় কমিউনিস্ট পার্টিতে। দাদার প্রতি ভালবাসা সত্ত্বেও রাজনৈতিক মতবিরোধের কারণে দাদার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে সে। সেই সাক্ষ্যের জেরে দাদা বিলুর ফাঁসি হবে। নীলু সারা রাত জেল গেটে দাদার মৃতদেহ গ্রহণ ও সৎকারের জন্য প্রতীক্ষা করছে। জেলের মধ্যে ফাঁসির আসামী বিলু, তার বাবা, মা আর গেটের বাইরে নীলু– সবাই রাত্রি জাগছে যন্ত্রণা-জর্জরিত হৃদয়ে ভয়াবহ এক মুহূর্তের প্রতীক্ষায়। রাত্রি শেষে এক সাধারণ কয়েদির ফাঁসি ও বিলুর শাস্তি স্থগিতের এক চরম মুহূর্তে কাহিনি সমাপ্ত হয়।

ভারতবর্ষকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্য যখন দেশের হাজারো জনতা জীবন উৎসর্গ করছে, ঠিক তেমনি এক উত্তাল সময়ে সতীনাথ ভাদুড়ী *জাগরী* রচনা করেন। ৪২-এর আগস্ট আন্দোলনে অংশগ্রহণ নিয়ে সরকারের চোখে চরম অপরাধী বিপ্লবী দেশপ্রেমিক বিলু। তার ফাঁসির আদেশকে কেন্দ্র করে সে নিজে, আপার ডিভিশন ওয়ার্ডে বাবা, আওরৎ কিতায় মা, জেলগেটে ছোট ভাই নীলু সবাই চিন্তায় বিভোর হয়েছে। অতীত ও বর্তমান পরম্পরায় তাদের সমবেত চিন্তাস্রোত ক্রমশ গাঢ় হয়েছে চরম মুহূর্তের জন্য। তাদের আত্মকথন ও স্মৃতি রোমন্থনের মধ্য দিয়েই *জাগরী*র কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। বাবার স্বীকারোক্তিতে জানা যায় ব্যক্তিগতভাবে বাবার সাহচর্য বড় একটা পায়নি সে। এই অপ্রাপ্তির বেদনা থেকেই মায়ের সঙ্গেই বিলুর অন্তরের যোগাযোগ ছিল বেশি। বিলুর মতো বিলুর স্রষ্টা সতীনাথ ভাদুড়ীও রাশভারী, গম্ভীর পিতা ইন্দুভূষণ ভাদুড়ীর স্নেহ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। বিলুর মতো সতীনাথেরও আশ্রয়স্থল ছিল তাঁর মা রাজবালা দেবী। মায়ের ভুল কথার প্রসঙ্গ তুলে তাকে রাগিয়ে দেওয়া, মায়ের কোলে শোয়া নিয়ে নীলুর সঙ্গে ঝগড়া, দুপুরবেলা মায়ের কাছে বসে রামায়ণ মহাভারত পড়া প্রভৃতি বিষয় বিলুর বর্ণিল বাল্যকালকেই স্পষ্ট করে। বিলুর আপাত স্নেহপ্রবণ স্বভাব-প্রকৃতির কোমল দিকটির পাশাপাশি বাবা তার চরিত্রে কঠোর রূপকেও তুলে ধরেছেন। তারের উপর চড়ে সাহেব-মেমদের উৎসব দেখা নিয়ে বাবা বিলুকে শাসন করলে বিলু তার বাবার মুখের উপর কথা বলেছে, মায়ের সঙ্গে সে একইভাবে তর্ক করেছে। বাবা তার চরিত্রের কঠোর দিকটি লক্ষ করে বলেন :

> জোর করিয়া বিলুকে দিয়া কেহ কিছু করাইয়া লইবে তাহা হইতে পারে না। উহাকে ঠকাইয়া, খোশামোদ করিয়া বা উহার কোমল হৃদয়ের সুবিধা লইয়া, উহাকে দিয়া লোকে যে-কোনো কাজ করাইয়া লইতে পারে। কিন্তু গায়ের জোর দেখাও, বিলু রুখিয়া দাঁড়াইবে। মুহূর্তের মধ্যে স্বাভাবিক নমনীয়তা কোথায় চলিয়া যায়।[৮]

বিলুর অন্তরের এই সুপ্ত পৌরুষত্বের বিস্ফোরণই যেন তার ভবিষ্যতের পথ নির্ধারণ করে দিয়েছে। শৈশবে গান্ধী আশ্রমে এবং গান্ধী-সংস্কারে মানুষ হলেও ক্যাম্প জেলে থাকা কালে কংগ্রেসের ব্যর্থতার কথা ভেবে শেষ পর্যন্ত বিলু যোগ দেয় সোস্যালিস্ট পার্টিতে। সমকালে যেভাবে মানুষ অহিংস কংগ্রেস ছেড়ে সহিংস আন্দোলনে পা বাড়াচ্ছিল, বিলু ও নীলু ছিল সেই পরিবর্তিত মূল্যবোধের ধারক ও বাহক। ছোটবেলায় যে বিলু টেপির মা, দুর্গার মা, জিতেনের মা দিদিদের সামনে রামায়ণ-মহাভারত পড়ে

শুনিয়েছে; পৈতে ধারণ করেছে, আশ্রমের প্রার্থনায় যোগ দিয়েছে, 'দেবভক্তি-পূজো আচ্চায়' ঝোঁক দেখিয়েছে, 'শ্লোক-মন্তর' মুখস্থ করেছে; সে বড় হয়ে একে একে সব কিছু ছেড়ে নাস্তিক হয়েছে। জেলে বাবার পাঠানো গীতা ফেরত দিয়ে সে বলেছে, 'ঐ বইয়ের দরকার নাই, অন্য ভাল বই-টই দেন তো পড়িতে পারি।' পড়া ও পড়ানোর বিয়য়ে কমরেড বিলুর আগ্রহ ছিল প্রবল। বিলুর পাণ্ডিত্যের বিষয়ে কমরেড বাণারসী চুরুট টানতে টানতে বিলুর বাবাকে জানিয়েছে :

> বিলুবাবুর মতো আমাদের দলে আর কেহ পড়াতে পারে না। সেইজন্যই সেবার যখন শোনপুরে আমাদের প্রাদেশিক সামারক্যাম্প খোলে– সেখানে বিলুবাবুর উপর 'ডায়ালেক্‌টিকাল মেটিরিয়ালিজম' পড়াইবার ভার পড়িয়াছিল। 'অপরচুনিস্ট'দের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি কেবল যথার্থ কর্মীদের কথা ধরা যায়, তবে আমাদের দলের 'ইনটেলেক্‌চুয়াল্‌স্‌'-এর মধ্যে বিলুবাবুর স্থান খুব উচ্চে।[৯]

মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আগস্ট আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে দেশপ্রেমিক বিলু। ছোট ভাই নীলু ও সহদেওকে সঙ্গে নিয়ে বকড়িকোলে মিটিং করা, গাছের গুঁড়ি রাস্তায় ফেলে রাস্তা অবরোধ, থানা জ্বালিয়ে দেয়া, কৃত্যানন্দ নগর রেলস্টেশন বন্ধ করা ইত্যাদি কাজে নেমে পড়েছিল সে। বিলুর এরূপ কার্যক্রমের সঙ্গে ঔপন্যাসিক সতীনাথ ভাদুড়ীর ব্যক্তিজীবনের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সতীনাথও পূর্ণিয়া কংগ্রেসের সর্বোদয় নেতা বৈদ্যনাথ চৌধুরীর টিকাপট্টি আশ্রমে যোগ দিয়ে জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন। তৎকালীন 'পূর্ণিয়া জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক সতীনাথ সংগঠনের তহবিলের হিসাব রক্ষা, রিভলবার পিস্তল আদান-প্রদান, পায়ে হেঁটে রাতের অন্ধকারে জলকাদা ভেঙে দূরবর্তী জায়গায় গোপন সভা-সমিতি পরিচালনা, আন্দোলনের সক্রিয়তার জন্য বন্দি হয়ে কারাবরণ ইত্যাদি ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।'[১০] গ্রামে-গঞ্জে দিকে দিকে 'গান্ধীজীকা জয়', 'ভারতমাতাকি জয়', 'দেশকি পুকার' বলে যে শ্লোগান তোলা হয়েছে, বিলুবাবু তার নেতা। মিছিলের মধ্য থেকে জয়ধ্বনি দিয়ে জনতাই তাকে নেতা বানিয়েছে। দেশভক্তি ও জনসেবা অস্থিমজ্জায় লেগে থাকা বিলুর চোখে কেবল স্বাধীনতার স্বপ্ন। সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে সে সাম্যবাদের সমাজ গড়তে চায়। তাইতো রাজবন্দিদের শ্রেণিভেদকে সে সহজে মেনে নিতে পারে না। ত্যাগ ও সেবার মাধ্যমে দেশ ও জাতির কল্যাণ বিধানই যে রাজনীতির উদ্দেশ্য তা বিলুর সত্যদৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। রাজনীতি নিয়ে তার অনুগামীদের বোঝাতে গিয়ে সে তাদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে সজাগ করে দিতে ভোলেনি। পরাধীন ভারতবর্ষে একজন সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ রাজনৈতিক কর্মীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিলুর মন্তব্য– 'তখ্‌ত ইয়া তখ্‌তা'– আশা করি ফাঁসির রজ্জুর, হয়তো গৌরবের রাজমুকুট পাইতেও পারো। অপার ক্লেশের জীবন।'[১১] এরূপ ভাবনার অনুষঙ্গে বিলু মার্কসবাদী ও কমিউনিস্টদের মতাদর্শের কাছাকাছি চলে আসে। বিলুর কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির মধ্যেও অবশ্য সমাজতন্ত্রের ভাবনা ক্রিয়াশীল ছিল। কমিউনিস্ট আদর্শে বিশ্বাসীদের সততা ও নিয়ম-নিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়ে বিলু বলেছে :

> ...আমার যদি অনেক টাকা থাকিত, তাহা হইলে আজ উইল করিয়া যাইতাম। অনেক কোটি টাকা। তাহা দিয়া মার্কসবাদের প্রচার কার্য চলিত। ভারতের প্রতি গ্রামে গ্রামে রুশের বালক ও কিশোরদের সংঘের ন্যায় দলের সংগঠন হইতে পারিত।[১২]

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও দেশপ্রেমিক বিলুর আত্মসম্মান ছিল প্রবল। একজন জেল ওয়ার্ডার যখন দেশসেবক বিলুকে 'আসামী' বলে, তখন তার অন্তর ক্ষোভে দুঃখে ভরে ওঠে। করুণা কিংবা সহানুভূতি নয়, বিলু তার ত্যাগের জন্য 'কথায় না হোক অন্তত হাবভাবে' তাদের কাছে প্রশংসা আশা করে। জেলের সুপারিনটেনডেন্ট এসে কোনো জিনিসের দরকার আছে কিনা জানতে চাইলে মনে মনে একটা মশারির কথা ভেবেও বলতে পারেনি আত্মমর্যাদাবান বিলু। একজন ওয়ার্ডার বিলুকে 'আসামী' বললেও অন্য আর একজন ওয়ার্ডার তার মাথার সরিষার তেল জোগাড় করা ও তার গায়ের কাপড় কেচে পরিষ্কার করার মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা জানায়। সরস্বতীর সঙ্গে বিলুর নিবিড় সম্পর্ক ছিল। কিন্তু মায়ের আপত্তি, কপিল

দেও-এর বংশের গোলমাল, অবাঙালি সংস্কৃতি ও বিলুর রাজনৈতিক জীবন বিবেচনায় সরস্বতীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়নি। বিলু চরিত্রের তন্ময়তা ও কিছুটা অন্তর্মুখিতা তাকে প্রচলিত অর্থে 'রাজনীতিসর্বস্ব জীব' হতে দেয়নি। লোহার গরাদের মাঝখান দিয়ে সামান্য যে নীলাকাশ দেখা যায় তার মাঝেই বিলু বারবার নিজেকে খুঁজেছে :

> আকাশের ঐ ফালিটুকু আমার একান্ত আপন– ও যে আমার নিজস্ব জিনিস। যতক্ষণ দেখা যায় ঐ স্বচ্ছ নীল রঙ দেখিয়া লইয়াছি। এমন করিয়া আমার মতো করিয়া, আকাশের ঠিক ঐ অংশটুকুকে কি আর কেহ পাইয়াছে? আমার নীল আকাশ মুহূর্তে মুহূর্তে রূপ বদলাইতেছে। সিঁদুরে রঙ বেগুনি হইয়া উঠিল,– দেখিতে দেখিতে ধূসর হইয়া উঠিতেছে– আবার এখনই জমাট অন্ধকারে ডুবিয়া যাইবে। এমন বৈচিত্র্যময় রসের উৎসকে জেলর সাহেব একজন সর্বহারা বন্দির ব্যক্তিগত সম্পত্তি করিতে কেন যে দিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি না।[১৩]

জেলখানায় এমন বৈচিত্র্যময় রসের উৎসকে 'সর্বহারা' রাজবন্দি বিলুর 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি' করার আপত্তিতে বিলুর রাজনৈতিক মতাদর্শের ছায়া পড়ে। আর স্বচ্ছ নীল রং আকাশের রূপ বদলানোর মধ্য দিয়ে বিলু যেন মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে যায় অভীকমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে; বিলুর স্মৃতি– তার উচ্চারণ যেন ঐ ভয়ঙ্কর রাত্রির জমাট অন্ধকারকে হার মানায়। বিহারের পূর্ণিয়া সেন্ট্রাল জেলে বন্দি বিলুর চেতনাবিন্যাসে ফাঁসির পূর্বরাতে তার অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও অতীত স্মৃতির বিস্তার ঘটেছে।

ব্রিটিশ শাসনে ভারতবাসী দাসত্বের অন্ধকার কেটে জেগে উঠে আলোর সন্ধান করে। তবে বিলুর কাছে অন্ধকারের আগের মুহূর্তটুকুই বেঁচে থাকা। জীবনে ঘনিয়ে আসা অনন্ত অন্ধকার বিলীন করে দিতে চায় তার সমস্ত অস্তিত্বকে। বেঁচে থাকার প্রাণান্ত চেষ্টায় সে স্মৃতির আকাশে পাখিদের মতো ডানা ঝাপটায়। যার জীবনে কোনো আশা থাকে না, ভবিষ্যৎ থাকে না, বর্তমান থাকে না; তার থাকে শুধু ফেলে আসা অতীত। তার মনে ঘুরে ঘুরে আসে স্মৃতির আবর্ত। সেই অতীতের স্মৃতিভাণ্ডে আশ্রয় নিয়ে সে অতিক্রম করতে চায় বেঁচে থাকা মুহূর্তটুকু। নীলুর কথা ঘুরে ঘুরে আসে যদিও নীলু তার ভাই এবং প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক পার্টির স্থানীয় নেতা হিসেবে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে। সিমেন্ট বাঁধানো সেলের আঙিনায় অসংখ্য বুটের শব্দে বিলু মৃতপ্রায়। সমাসন্ন মৃত্যুর সম্ভাবনায় প্রিয়জনদের কাছে পাওয়ার বাসনা থেকে জ্যাঠাইমা, সরস্বতী, মা, বাবা, নীলু সবাই তার চোখের সামনে দিয়ে সরে সরে যায়। তখন বৃহত্তর রাজনৈতিক জগতের বাইরে ব্যক্তি বিলুকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। রাজনৈতিক আদর্শবাদে দীক্ষিত হয়ে তার জীবন আজ সংকটাপন্ন। মৃত্যুর শিরশির অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ে তার দেহ ও মনের সর্বত্র। ফাঁসি কাষ্ঠে বিসর্জিত বিপ্লবীর মৃত্যুচেতনা বিলুর জাগরিত ভাবনাকে অবিরত জীবনের অন্তিমে পৌঁছে দেয়।

আপার ডিভিশন ওয়ার্ডে বন্দি বিলুর বাবা গান্ধীবাদী রাজনীতির নিষ্ঠাবান কর্মী। সান্যাল মশাই আদর্শবাদী জীবনচর্যায় অভ্যস্ত হলেও বস্তুজগতের নানা দ্বিধা-সংশয়, পুত্রদ্বয়ের দুই ভিন্ন ধারা রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণে তার অসহায়ত্ব, সাধারণ গৃহী মানুষের মতো স্ত্রী-পুত্র-সংসার প্রতিপালনে অপারগতা তাকে প্রতি মুহূর্তে বিক্ষত করেছে। আদর্শগতভাবে নিজের অভিষ্ট লক্ষ্যে অবিচল থাকলেও শেষ পর্যন্ত তার পিতৃহৃদয়ের আপত্য আকুলতা প্রবল হয়ে উঠেছে। 'জাতীয় গগনের দিব্যজ্যোতি' জাতীয় পতাকাকে নমস্কার জানিয়ে আরম্ভ হয় মাস্টার মশাই বাবার চিন্তনপ্রবাহ। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে দীক্ষিত বাবা আপাদমস্তক এক আদর্শবাদী চরিত্র। গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বানে প্রাণিত হয়ে তিনি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন দেশের স্বার্থে, বাড়িকে করে তোলেন রাজনৈতিক আশ্রম। সততা, অহিংসা, সহজ জীবনচর্চা, নিরামিষ আহার, ব্রহ্মচর্য পালন– মহাত্মা গান্ধীর জীবনের এই আদর্শগুলোকে তিনি মিশিয়ে নিয়েছেন সত্তার গভীরে।

পুত্রের ফাঁসির অব্যবহিত পূর্বে চরকা সুতা কাটার যন্ত্র যা রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার নয়, হয়ে ওঠে তার মানসিক অবস্থার প্রতিরূপ :

> চরকাটি লইয়া বসা যাক। মনের উদ্‌বেগ শান্ত করিতে এমন জিনিস আর নাই। কিছুক্ষণ একাগ্র মনে চরকা কাটিলে দেখিয়াছি স্নায়ুর উত্তেজনা ধীরে ধীরে শান্ত হইয়া আসে। ডাক্তাররা হাসুক, সোস্যালিস্টরা অবিশ্বাস করুক, আমার যে ইহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে।[১৪]

ছেলের ফাঁসির প্রাক্কালে বিনিদ্র উৎকণ্ঠায় যখন তিনি ছেলের মৃত্যুর প্রহর গুণছেন তখন চরকাও তার উদ্বেগ শান্ত করতে পারে না। কোনো প্রার্থনা তাকে বিপর্যয়কর ভাবনা থেকে মুক্তি দেয় না। তার সহমর্মীরা তার মনের ভার হালকা করার জন্য এক সাথে 'সামূহিক চরকা' আসর বসিয়েছেন। গভীর অনুভবশক্তি দিয়ে তা উপলব্ধি করলেও মনের দ্বিধা-সংশয়কে তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। বড় ছেলে সোস্যালিস্ট কংগ্রেস কর্মী বিলুর ফাঁসির সাজা তাকে যেন অহিংস আদর্শ থেকে অজ্ঞাতে খানিকটা বিচ্যুত করে দেয়। দেবতুল্য মহাত্মা গান্ধীর আদর্শের কাছে আত্মসমর্পণ করে চরকাই হয়ে ওঠে তার শেষ সম্বল। *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি* গ্রন্থে নাজমা জেসমিন চৌধুরী 'বাবা' চরিত্রটিকে বিশেষ উচ্চতায় রেখেছেন– '*জাগরী*তে লেখকের সবচেয়ে প্রিয় ও আপনজন এবং সুঅঙ্কিত চরিত্রটি হচ্ছে গান্ধীবাদী বাবা। লেখকের সমর্থন ও শ্রদ্ধা পেয়ে চরিত্রটি স্বয়ং গান্ধীতুল্য হয়ে উঠেছে।'[১৫] বিলুর ভাবনায় বাবার উপস্থিতি একজন রাশভারী আদর্শবাদী অভিভাবক হিসেবে। মাস্টার সাহেবের ছেলে হিসেবে কোথাও এক প্রচ্ছন্ন গর্ববোধও হয়তো তার মধ্যে আছে, কিন্তু বাবার মনের গহনলোকে তার অনুপ্রবেশ ঘটেনি। পুত্রদের সঙ্গে সহজ সম্পর্ক স্থাপিত না হওয়ায় বাবার মনের গভীরে কোথায় যেন ব্যথা বাজে। 'আওরৎ কিতা'য় মা স্বামীর সহধর্মিণী হয়ে বন্দিনী; যদিও তিনি যথার্থ সহকর্মিণীর মর্যাদা কখনো পাননি। পরিবারের এই পরিণতির জন্য তিনি তার স্বামীকেই অভিযুক্ত করেছেন। ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করায় তিনি অসহিষ্ণু হয়ে প্রশ্ন তুলেছেন– 'তুমি দেশের স্বাধীনতার জন্য সব ছেড়েছো সত্যি– কিন্তু আমাকে তো একটু স্বাধীনতা দাওনি।'[১৬] মায়ের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাবা চরিত্রের রক্ষণশীলতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির দিকটি স্পষ্ট হয়। বাবা গান্ধীজির মতো সোমবার আত্মশুদ্ধি করেন, সন্ধ্যার পর প্রার্থনা করেন, মহিষের দুধ বা ঘি কোনোটাই খান না। জপের সময় একাগ্রতার জন্য মশারি ব্যবহার করলেও রাতে শোওয়ার সময় মশারি ব্যবহার করেন না। বাবা চরকায় সুতো কাটার মাধ্যমে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন, তার হৃদয় জুড়েই গ্রামীণ ভারত গড়ার রূপরেখা। আদর্শনিষ্ঠ বাবার চিন্তায় সাম্য-শান্তি-সুস্থিতির প্রতিচ্ছবি। কেবল তিনি নন, জেলের ভিতরের সংখ্যা গরিষ্ঠ, বয়স্ক ও ঈশ্বরবিশ্বাসী কংগ্রেসকর্মীদের মধ্যেই এই ভাবনার প্রতিফলন দেখা যায়। কিন্তু বাবা তার দলের নীতি-আদর্শ দিয়ে নতুন প্রজন্মের যুবকদের ধরে রাখতে পারেননি; এমনকি নিজের পুত্র বিলু ও নীলুকে পর্যন্ত না। মহাত্মা গান্ধীর উচ্চ রাজনৈতিক আদর্শ ত্যাগ করে রাজনৈতিক কর্মীদের দলে দলে চলে যাওয়ার বিষয়ে জাতীয়তাবাদী ও দেশভক্ত বাবা ক্ষোভের সঙ্গে বলেন :

> নিজের দেশের বেদ পুরাণ মুনি ঋষি, ইতিহাস সব গেল– সকলের নজর রুশের উপর। আরে, রুশ কি নিজের দেশের চাইতেও উঁচুতে? দেশ-বিদেশের ইতিহাসের কথা আমরাও পড়িয়াছিলাম। ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্‌ডি, ওয়াশিংটন, কোসুথের অমর কাহিনী আমাদেরও রোমান্স আনিয়া দিত। তাঁহাদের কীর্তির প্রেরণাই তো আমাদের ছাত্রাবস্থায় অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া শিবাজীর গৌরবগাথা ভুলিয়া যাই নাই। বিবেকানন্দের বাণী ছাড়িয়া মার্ক্সের বুলির ফাঁদে পড়ি নাই। মহাত্মাজী অপেক্ষা স্টালিনকে বড়ো বলিয়া মনে করিতে পারি নাই।[১৭]

বিলুর বাবার রাজনৈতিক মতাদর্শ এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ায়। আত্মপক্ষ সমর্থন করে বিলুর এই পরিণতির জন্য তিনি দায়মুক্তি খোঁজেন। বিলু ও নীলুর প্রতি পিতা হিসেবে তার শিক্ষা, শাসন ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি ছিল না। সেই মুহূর্তে কোন আদর্শবাদী রাজবন্দি হিসেবে নয়, একজন পিতা হিসেবে ফাঁসির দণ্ডে দণ্ডিত ছেলের ফাঁসির পূর্বমুহূর্তে তার কাছে থাকতে মন চায় তার।

ভারতবর্ষকে জাগিয়ে তোলার জন্য বিলুর গান্ধীবাদী পিতা মনে করেন– 'সূত্রযজ্ঞ' করেই একদিন সোনার ভারত গড়ে উঠবে। কিন্তু দলে দলে রাজনৈতিক কর্মী সোস্যালিস্ট হতে চলেছে। আদর্শবাদী কংগ্রেসকর্মী বাবার যে মূর্তি সতীনাথ গড়েছিলেন– জীবনকে নির্মোহ উদাসীনতায় দেখা সেই মানুষটি শেষ পর্যন্ত বদলে যান। তিনি গল্প শুনেছেন– একজনের হয়ে অপরের দণ্ড ভোগ করা বা অপরের রোগ গ্রহণ করার। এমন যদি হতো, তাহলে বিলুর জন্য এই যন্ত্রণা ভোগ করার চেয়ে তার জন্য প্রাণ বিসর্জন দেয়া শ্রেয় ছিল। সবকিছু ধুয়ে মুছে সত্য হয়ে ওঠে শুধু পিতৃহৃদয়ের গভীর যন্ত্রণার অভিব্যক্তি। সহবন্দি সুরজবল্লীবাবু তার মনে শক্তি যোগাতে গীতার শ্লোক পাঠ করেন, যাতে শববাহী ট্রাকের সেই অন্তিম মুহূর্তের শব্দ কানে না আসে। পুত্রের ফাঁসির আশঙ্কায় প্রহর গোণা নিদ্রাহীন পিতার মস্তিষ্কে সাড়া জাগাতে ব্যর্থ হয় গীতার সান্ত্বনা। বিলুর নাস্তিক্য ও নীলুর কর্তব্যজ্ঞানের কঠোরতার কাছে সব ভালবাসা তুচ্ছ হয়ে যায়। মহাত্মা গান্ধী যেমন দল-মত, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে এক পতাকাতলে এনে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, একইভাবে বাবাও কংগ্রেস-সোস্যালিস্টদের তথা নবীন-প্রবীণ সবাইকে শেষ পর্যন্ত ভজনালয়ে একত্রিত করতে পেরেছিলেন।

জাগরী উপন্যাসে মা চরিত্রটি চিরায়ত বাঙালি গার্হস্থ্য পরিবারের মাতৃ-প্রতিমূর্তি। 'রাষ্ট্রীয় পরিবারে'র কর্ত্রী হয়ে, গান্ধীবাদী স্বামীর স্ত্রী হয়ে কিংবা রাজনীতি করা সন্তানদের মা হয়েও তিনি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠতে পারেননি। অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র না হয়ে সাধারণ বাঙালি নারী হিসেবেই তিনি স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখ-দুঃখে ঘরকন্না করতে চেয়েছেন। কিন্তু তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অস্থিরতা তার পরিবারের পরিধিতেও আছড়ে পড়েছে। স্বামী গান্ধীজির আদর্শে দীক্ষিত হয়ে চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে আশ্রম খুললে তিনি স্বামীর অনুগামিনী হয়েছেন। সব মেনে নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছেন। আরতির সময় বিলু নীলু না এলে তাদের বাবা রাগ করবেন ভেবে ভীত হয়েছেন। স্বামীর আদেশে রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে 'স্বয়ং সেবিকা প্রতিজ্ঞাপত্রে' দস্তখত করতে গিয়ে অপমানিত হয়েছেন। স্বামীর আদর্শ প্রতিপালনের মধ্য দিয়ে স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখাই ছিল তার ধ্যান-জ্ঞান। নিরামিষ খাওয়া থেকে শুরু করে জাতিভেদ উপেক্ষা করে একসঙ্গে পঙ্‌ক্তিভোজন– আপত্তি না করে সবই মেনে নিয়েছেন। কিন্তু মনের ভেতর তিলে তিলে যে অসম্ভব ক্ষোভ দানা বেঁধেছিল, তা প্রকাশিত হয়ে পড়ে ছেলের ফাঁসির পূর্ব মুহূর্তে। সমস্ত ক্ষোভ উগড়ে পড়ে বিলুর বাবার উপর। তার মনে হয় বিলু-নীলুর এই পরিণতির জন্য তার স্বামী ও স্বামীর গান্ধীবাদী রাজনীতিই দায়ী। সাধারণ মানুষের বাস্তবভূমির উপর না দাঁড়িয়ে স্বদেশী যুগে গান্ধীবাদী আন্দোলনের সময় গান্ধীমিথ ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। মায়ের বক্তব্য ও ভাবনা থেকে তার রাজনৈতিক অবস্থানও চিহ্নিত করা যায়। সমকালের নানা রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিন্নতার আবর্তে বাঙালি গৃহবধূ মা চরিত্রটি ত্রিশঙ্কু অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে। বিলুর ভাবনা ও স্মৃতির মধ্য দিয়ে মা চরিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার স্মৃতিতে– 'মনে হইতেছে মা দাওয়ায় বসিয়া আছে।... মা ভাতের সহিত জলপাইয়ের আচার খাইতেছেন। সম্মুখের চুল সাদা-কালোতে মিশানো। তাহার পিছন দিকে দেখা যাইতেছে খদ্দরের শাড়ির লাল পাড়।'[১৮] বিলুর ভাবনাসূত্রে মায়ের আরো কয়েকটি স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। খাবার শেষে একটু দুধ না হলে যেন তার খাওয়াই হয় না। এটিই বোধ হয় মায়ের 'একমাত্র বিলাসিতা'। মায়ের অসুখ করলে অসুখ একটু বেশি হয়েছে বললেই তিনি খুশি হন। মায়ের ভুলগুলি পর্যন্ত তার সন্তানদের মুখস্থ। তিনি বলেন– অঙ্গার শত ধৌতেন 'মলিনশ্চ' নঃ মুঞ্চতে, দয়া 'দাক্ষিণাত্য', ঘুমানো অর্থে 'ঘুমতে' শব্দ ব্যহার করেন। এই নিয়ে সন্তানদের সঙ্গে তার হাসি-ঠাট্টা হয়। সন্তানদের শিক্ষার ভারও ছিল মায়ের উপর। তার অনুরোধেই বিলুকে ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত ইংরেজি হাইস্কুলে পড়ানো হয়, নীলুকে কলেজে পাঠানো হয়। বিলু-নীলুকে তিনি একেবারে নিজের করে রাখতে চান যাতে 'ওদের উপর কারও দাবি দাওয়া না থাকে'। সন্তানের ব্যাপারে মানসিক উদারতা-সংকীর্ণতা মিলিয়ে মা একটি বাস্তব চরিত্র হয়ে উঠেছে। জিতেনের মা জ্যাঠাইমাকে বিলু মা বলে ডেকেছে জেনে তার রাগ হয়। পুত্রের উপর থেকে অধিকার হারানোর প্রচলিত ভাবনা থেকে জিতেনের মায়ের উপর তার

বিদ্বেষ উগরে ওঠে। আবার পর মুহূর্তে অনুভব করে যে, বিলুকে হারালে জ্যাঠাইমার দুঃখ তার থেকে কম হবে না। অনুতপ্ত মনে তারপরই হাহাকার ভরা আকুতি নিয়ে বলে– 'অন্তরের থেকে যদি বিলুকে তোমায় দিতে পারতাম তাহলে কি দিদি বিলুকে তুমি বাঁচাতে পারতে? বিলু আমার বাঁচুক দিদি, আর তাকে তোমার হাতে দিতে আমি কিপ্টেপনা করব না।'[১৯] বিলুর ফাঁসির আগের রাতে অসুস্থ উৎকণ্ঠিত মা জেগে থাকেন আওরৎ কিতায়। তার স্মৃতিতে ভেসে উঠেছে বিলুর জীবনের নানা ঘটনা। কেন তিনি সেদিন সরস্বতীর সঙ্গে বিলুর বিয়ে দিলেন না। পড়াশুনা না জানা দেহাতী মেয়ের সংস্কৃতির সঙ্গে মিল না ঘটলেও বিলু হয়তো সংসারী হত। রাজনীতি করার ফলে অন্তত ফাঁসির শাস্তি হত না। বিলু ছেলেবেলায় যখন খুব রোগে ভুগেছিল, সেই সময় চলে গেলে নীলুকে পেয়ে সন্তান হারানোর যন্ত্রণা ভুলতে পারতেন। নিজের মধ্যেই তিনি সান্ত্বনা খুঁজে পান, কারণ তিনি যে সকল বিপ্লবীর মাতৃস্বরূপা। তিনি মনে করেন– 'ভগবান আমায় এমনি করেই সৃষ্টি করেছেন! তাহলে রাজ্যসুদ্ধ সবাইকে নিজের পেটে পুরে বসে থাকবো কি করে?'[২০] বিলুর মায়ের এই উক্তির মধ্য দিয়ে উপন্যাসটির আবেদন ব্যক্তিকে অতিক্রম করে সার্বজনীনতা লাভ করে। তার ভাবনা যেন দেশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে এনে দেশকে জাগিয়ে তোলার চিন্তা-ভাবনা থেকে উঠে আসে। তাই ব্যক্তির এই জাগরণ অন্য অর্থে বৃহত্তর রাতজাগার কাহিনিতে পরিণত হয়। আসন্ন সন্তান-বিচ্ছেদের বেদনা চিরকাল অবদমিত মাতৃসত্তাকে প্রতিবাদী করে তোলে। যিনি এতদিন স্বামীর সকল ইচ্ছা মাথা পেতে অনুসরণ করেছিলেন, আজ তিনি সেই স্বামীর দিকেই তুলেছেন অভিযোগের আঙুল। যে গান্ধীকে মা এতোদিন ঈশ্বরের স্থানে বসিয়েছেন, নেই গান্ধীজিকেও তিনি প্রশ্নের সম্মুখীন করেছেন। আসলে সংসারই তার কাছে আসল ব্রত– ধ্যান-জ্ঞান-শান্তি; সেখানে স্বয়ং গান্ধীজিও মিথ্যা, তুচ্ছ। পরিবারের এই পরিণতির জন্য মা তার গান্ধীবাদী স্বামীকে যেমন দায়ী করেছেন, একই সূত্রে মহাত্মা গান্ধীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন :

> গান্ধীজী, তুমি আমার একি করলে? তুমি আমাদের একেবারে পথের ভিখিরি করে ছেড়েছ; সত্যিকারের ভিখিরি। তুমি মাসের শেষে হাতে তুলে কিছু দেবে, তবে আমরা চারটি খেতে পাব। নিজের ঠাকুর দেবতা ছেড়ে তোমার পুজো করেছি; তোমার জন্য আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব ছেড়েছি; হাসতে ভুলেছি। তার প্রতিদান তুমি খুব দিলে। তোমার দেখানো রাস্তায়, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনের মিল হয় না, বাপ-ছেলেতে ভালবাসার সম্পর্ক থাকে না, ভাই ভাইয়ের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়, গৃহবিচ্ছেদে সংসার ছারখার হয়ে যায়। নিজের ইষ্টমন্ত্র ছেড়ে দিয়ে সন্ধ্যায় তোমার নাম জপ করেছি; কত বছর আগে আমাদের আশ্রমে যে জায়গাটায় তুমি বসেছিলে, সেইখানটায় প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ জ্বালিয়েছি; একদিনের জন্য চরকা কাটা ছাড়িনি, সে কি এরই জন্যে?[২১]

তিনি ইষ্টমন্ত্র ছেড়ে গান্ধীজীর নাম জপ করেছেন, মেথরকে হরিজন বলে তার ল্যাংটা ছেলের সঙ্গে নীলু-বিলুকে একত্রে রান্নাঘরের বারান্দায় বসিয়ে খাইয়েছেন। তার প্রতিফল কি এই হল! আবার ভাবেন বিলুর অসুখের সময় তিনি যে মানত করেছিলেন, সেই পূজা পূর্ণেশ্বরীর ওখানে দিয়েছেন তো? কিংবা বরহমথানে বিলু হবার সময় যে ইটটা বেঁধেছিলেন, সেটা খোলা হয়েছিল তো? হয়তো 'ডিহ্ওয়ার' দেবতা সরস্বতীর সঙ্গে বিলুর বিয়ে না দেয়ার জন্য রাগ করে তার এই সর্বনাশ করেছে। মায়ের মনের দুর্বলতা ধরতেই পারে না নীলু কেন বিলুর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল। 'এ তো আমি মরে গেলেও বিশ্বাস করতে পারি না। নীলু গোঁয়ার, নীলু অবুঝ, নীলু খামখেয়ালী সব ঠিক– কিন্তু সে যে দাদা অন্তপ্রাণ। নীলু কি কখনো এমন করতে পারে?'[২২] মায়ের দুর্বল মন স্মৃতির হাতড়ে খুঁজতে থাকে, কবে কোন দেবতার কাছে কী অপরাধ করা হয়েছিল। রাজনীতির চোখ দিয়ে জীবনকে না দেখে মা জীবনের দৃষ্টি দিয়ে রাজনীতিকে দেখেছেন। ছেলের ফাঁসির পূর্বরাত্রে বাবা চরকাকে সম্বল করেছেন, আর মা ভাবছেন চরকা ভেঙে দেবেন। মায়ের হৃদয় ভাঙার প্রতিফলন ঘটে চরকা ভাঙার ভাবনায়। এক স্ত্রীর অসহায়ত্ব, এক জননীর মর্মবেদনা আর বিচ্ছেদের হাহাকার মূর্ত হয়ে উঠেছে মায়ের হৃদয়ে। মহান ত্যাগের ব্রত কিংবা আদর্শ কল্পনা নয়, একান্ত পতিপরায়ণতা ও সন্তান বাৎসল্য মায়ের চরিত্রটিতে জীবন্ত করে তুলেছে।

লেখক *জাগরী*র মাকে গণ্ডীর বাইরে এনে বহু বিচিত্র রাজনৈতিক কর্মমুখরতার সম্মুখীন করতে চাইলেও, শেষ পর্যন্ত তিনি বাঙালি স্বভাবসুলভ সংস্কারের মধ্যেই থেকে গেছেন।

জেলগেটে অপেক্ষারত নীলু **তার** দাদার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে। বিলুর ফাঁসির পর সে লাশ নিয়ে সৎকার করার দাবিদার। জীবন-সন্ধানী শিল্পী সতীনাথ ভাদুড়ী নীলু চরিত্রটিকে রাজনৈতিক ও মানসিক দ্বন্দ্বে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। মাস্টার সাহেবের ছোট ছেলে নীলু ছোটবেলা থেকেই জেদি ও একগুয়ে স্বভাবের। তার দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা-ভাবনার মধ্যে সূক্ষ্মতার অভাব ছিল। বিলু তার ভাই সম্পর্কে যথার্থই বলেছে :

> নীলুর মন ও দৃষ্টিভঙ্গি স্থূল! কলম তুলিকা তাহার জন্য নয়– সে বোঝে কায়িক পরিশ্রমের কথা, হাতুড়ি কাস্তে শাবলের কথা, আর তার হাতে শোভা পায় ইস্পাতের ক্ষুরধার অসি– পরশুরামের কুঠারের মতো নিষ্করুণ ও কর্তব্যনিষ্ঠ।[২৩]

বিলুর স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়– দাদা ছাড়া সে আর কাউকে ভয় করতো না। দাদার সাথে মাঝে-মধ্যে ঝগড়া হলেও আবার তা পরক্ষণেই মিটে যেত। নীলু দেখত মা-জ্যাঠাইমা থেকে হরদার দুবেজী ও তার স্ত্রী, জিতেনের মা বৌঠাকরুন সবাই দাদা বিলুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। অথচ তাকে তেমন কেউ প্রশংসা করে না। এতে ভিতরে ভিতরে সে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তাই সুযোগ পেলেই বিলুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। বিলু জ্যাঠাইমাকে 'মা' ডাকায় নীলু সে কথা মাকে জানিয়ে দেয়। বিলুর দোয়াতের কালিতে নীলুর বই নষ্ট হলে নীলুও বিলুর বই কেটে দিয়ে তার প্রতিশোধ নেয়। তার প্রতিশোধ স্পৃহা এমন অবস্থায় পৌঁছায় যে সে দেব-দেবীকেও ছাড়ে না। অঙ্কে পাশ করতে না পেরে নীলু সরস্বতী দেবীর ফ্রেমে বাঁধানো ছবিখানার উপর বাড়ির সমস্ত জুতো এনে চাপায়। আশ্রমের প্রান্তে মাংস রেঁধে খেয়ে সে দুর্মর আনন্দ পায়। নীলুর মধ্যে ছোটবেলা থেকেই নিহিত ছিল ক্রোধ, ঈর্ষা ও স্বার্থপরতার বীজ। তাই শৈশব থেকে দাদা অন্তপ্রাণ নীলু কেন তার দাদার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে দাদার মৃত্যুর কারণ হল– সে কথা সাধারণ মানুষ বোঝে না। নীলুর মনে পড়ে যায় কীভাবে সে আর তার দাদা কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিল। ১৯৩০ ও ১৯৩২ সালের আন্দোলনে ক্যাম্পজেলে থাকার সময়ে তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দ্বিধা সৃষ্টি হয়। ১৯৪০-এ গ্রেপ্তার হবার পর বিলুর থেকে নীলুর রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্য ঘটে। বিলুকে না জানিয়ে নীলুর কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করে। নতুন দলে যোগদানের ফলে দাদার সঙ্গে নীলুর রাজনৈতিক ব্যবধান সৃষ্টি হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী দলের নামজাদা কর্মী দাদার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা পার্টির লোকজন পছন্দ করে না। ফলে আদর্শবোধ দাদার সঙ্গে নীলুর দূরত্বকে বাড়িয়ে দেয়, যদিও ভালবাসা তখনও অটুট থাকে। দাদাকে ছাড়িয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নীলু রাজনীতি ক্ষেত্রে নিজের 'নাবলকত্ব ঘোচাতে' চায়। নীলু ভাবে :

> রাজনীতিক কর্মীর জীবন তাহার পার্টির ভিতরে– পার্টির বাহিরের অস্তিত্ব তাহাকে একেবারে লুপ্ত করিয়া দিতে হইবে। ইহার পর হইতে আমি দাদাকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছি। নেহাত ব্যক্তিগত কাজের কথা ব্যতীত আর অন্য কোনো কথা হয় নাই। আমার সর্বদা ভয় যে, আমার পার্টির লোকেরা আবার কী মনে করিবে। দাদা যে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী দলের নামজাদা কর্মী। উহার সহিত অন্তরঙ্গতা আমার পার্টির লোকেরা নিশ্চয়ই পছন্দ করিবে না।[২৪]

নীলু পার্টিসর্বস্ব আচরণ করলেও বিলু দাদা হিসেবে বিছানাপত্র তৈরি করে দেয়া, বাবা-মার চিঠির বিষয়ে খোঁজ-খবর নেয়া প্রভৃতি কাজ স্বচ্ছন্দে করে গেছে। সময়ে পাল্টে যাওয়া নীলু ৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা বিলুর বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষ্য দেয়। আর তার পরিণতিতে বিলুর ফাঁসির আদেশ হয়। নীলুর সাক্ষ্যদানের এই ঘটনা পরিবারের ভেতর ও বাইরের মানুষ সবাই নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেছে। রাজনীতি ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে পার্থক্যের কথা স্মরণ করে আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করেও ভিতরের চাপা উদ্বেগ নীলুকে তাড়িত করে। সে ভাবে যে বিলু

তাকে ভুল বুঝবে না। এমন কি বিলুর সঙ্গে কথা বলতে পারলে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যেত বলে তার ধারণা। অন্তরাত্মার বিরোধিতার পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তি-বুদ্ধিহীন নীলু ভাবে :

> কিন্তু সকল যুক্তিকে পরাস্ত করিয়া অন্তরের ভিতর কোথায় যেন খচ্‌খচ্‌ করিয়া কি একটা বিঁধিতেছে। বোধ হয় যুক্তিহীন ভাবপ্রবণতার অহেতুক অনুতাপ। আমার নিজের পার্টির স্থানীয় শাখার মেম্বারদেরও মত যে দাদার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া ঠিক হয় নাই।[২৫]

দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ নীলু স্বাভাবিকভাবেই নিজের কৃতকর্মের জন্য অন্তর্দহন অনুভব করে। কেননা সাময়িক উত্তেজনা ও আবেগের বশে নীলু যে কাজ করেছে তা রাজনীতি ও পরিবারের শোভন সীমার বাইরে। একগুঁয়ে নীলু ঈর্ষাবশত হঠকারীভাবে দাদার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে নিজেকে মহান করে তোলার মোহে নিজেই ধরাশায়ী হয়েছে। পরিবার তথা মানবধর্মকে উপেক্ষা করে কোনো নীতি-ধর্ম বড় হতে পারে না– নীলু এই সত্য বিস্মৃত হওয়ায় বিপত্তি ঘটেছে। সর্বোপরি যে পার্টির কথা ভেবে সে একাজ করেছে, সেই কমিউনিস্ট পার্টির তত্ত্বকথা সে ভাল বোঝে না, তা সে নিজেই স্বীকার করেছে :

> মার্ক্সবাদের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হয়তো আমি ঠিক বুঝি না। যতদিন দাদাদের দলে ছিলাম দাদারই হুকুম তামিল করিয়া আসিয়াছি। উহার কথাই বেদবাক্য বলিয়া মনে করিয়াছি।[২৬]

দাদার অন্তিম যাত্রার ভবিতব্যকে অবলোকন করে নীলুর রাতজাগা উৎকণ্ঠিত হৃদয় চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়। কালেক্টর সাহেব নীলুর হাতে মৃতদেহ তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত যোগ করে শোকযাত্রা না করার। কিন্তু লোকে তো সে কথা শুনবে না :

> ...অন্তহীন নরপ্রবাহের সর্পিল গতি।... নীরব– 'গান্ধীজীকা জয়' নাই– 'বিলুবাবুকা জয়' নাই– শোকের 'মর্সিয়া' গীত নাই– বিশৃঙ্খল জনসমুদ্রের উদ্দণ্ডতা নাই। আছে মুহ্যমান শোকের নিষ্ক্রিয়তা– আছে একটি 'রাষ্ট্রীয় পরিবারে'র একজন ছাড়া অপর সকলের প্রতি অপরিসীম সহানুভূতি– আছে সুপ্ত দেশাত্মবোধের ধিক্কার– আছে ভস্মের দৃশ্যমান শীতলতার মধ্যে ব্যর্থ আক্রোশের জাগরুক বহ্নি। এক ইশারায় এই অসহায় শান্ত জনতা হিংস্র ও উন্মাদ হইয়া আমাকে ছিঁড়িয়া টুকরো টুকরো করিয়া ফেলিতে পাড়ে।... সম্পূর্ণ হরতাল।[২৭]

নীলুর ভাবনায় উঠে এসেছে স্বরাজ সাধনার আড়ালে উপেক্ষিত নিম্নবর্গের মানুষের বেদনাবোধ। মহাত্মাজীর চেলা পুণ্যদেওজী দরখাস্ত জমা দিয়ে তদ্বির করার অজুহাতে মাথাপিছু আট আনা করে পারিশ্রমিক নেন। জেলা কংগ্রেস কমিটির মেম্বার কপিলদেও-এর নির্দেশে 'দহিভাত' গ্রামের অসহায় তেলী বৌকে ডাইনি সাব্যস্ত করে তার বাড়ি পুড়িয়ে ছাই করে দেয়া হয়; তার জমিটুকু গ্রাস করার জন্য তার নামে সদরে 'ডিক্‌রী' জারি করা হয়। এ প্রসঙ্গে নীলুর বিশ্লেষণ উল্লেখ করা যায় :

> ...সত্যই তো কংগ্রেস সংগঠন, সম্পূর্ণ ধনী কিষাণদের হাতে জমিদারের শোষণ হইতে তাহারা মুক্ত হইতে চায়; কিন্তু নিজেরা তাহাদের সীমিত ক্ষেত্রে আধিয়াদার, বাটাইদরি বা নিঃসম্বল ক্ষেতমজুরদের উপর শোষণ বন্ধ করিতে চায় না; কংগ্রেস মিনিস্ট্রির সময় নিঃস্ব রায়তদের জন্য যতগুলি আইন তৈয়ারি হইয়াছিল, সবগুলিই ইহারা কূটকৌশলে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। সহদেও-এর মতো কংগ্রেসকর্মীও আধিয়াদারের কায়েমী স্বত্ব বন্ধ করিবার জন্য 'বন্দোবস্তী'র মিথ্যা দলিল তৈয়ারি করিয়াছে।[২৮]

কংগ্রেস সম্বন্ধে মোহভঙ্গের জন্যই বিলু-নীলু কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিল; তারপর দুই ভাইয়ের পথ আলাদা হয়ে গিয়েছিল মতাদর্শগত সংঘাতে। উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহে অতি সূক্ষ্মভাবে উঠে আসে সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণভেদ ও প্রাদেশিকতা প্রসঙ্গ। ভাবনা আবার ফিরে আসে বর্তমানে। দাদার খবরের জন্য উৎসুক হয়ে ওঠে। অপরাধবোধ থেকে তার মনে হয়, তার নতুন মতাদর্শ সম্বন্ধে যদি দাদাকে বুঝিয়ে বলতে পারত! তবু সে জানে, দাদা নিশ্চয়ই তাকে ভুল বুঝবে না। আগস্ট আন্দোলনের ঘটনাধারা মনে করে সে মনকে প্রবোধ দেয়– দাদার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে সে কোনো অন্যায় করেনি।

তথাপি ব্যক্তিগত ও পারিপার্শ্বিকতা বিচারে অপরাধবোধ তৈরি হয়। অস্বাভাবিক উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রহর গোণার অনুভূতি তাকে অর্ধমৃত করে দেয়। আর এই অর্ধমৃত অবস্থায় সম্পূর্ণ মৃত একটি দেহের জন্য অপেক্ষা করতে করতে সে জানতে পারে তার দাদার ফাঁসি হয়নি। জেলের অভ্যন্তরীণ খবর সাধারণ কয়েদিদের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি বলে ভুল বোঝাবুঝি থেকে উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হয়েছিল। দাদা অন্তপ্রাণ নীলু রাজনীতির সরণি বেয়ে দাদা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে ফাঁসির আদেশের কারণ হয়েছে। আবার সেই দাদার মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার জন্য জেলগেটে দুশ্চিন্তায় রাত কাটিয়েছে। চিন্তার স্রোতে রাষ্ট্রীয় পরিবারের সদস্য নীলু পরিবার ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার কথা ভেবেছে। সব মিলিয়ে নীলু চরিত্রের বিবর্তন ও সংকট অত্যন্ত জটিল। উপন্যাসের শেষে মহৎ ও আদর্শবান বিলুর জয় এবং নীলুর মানসিক পরাজয় ও পলায়নপর মনোবৃত্তি চরিত্রটিকে আরও অবনমিত করেছে।

সমকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অস্থিরতাজনিত বিভ্রান্তির প্রেক্ষাপটে ইতিহাস ও পরিবারের দ্বিবাচনিকতার সূত্রে গাঁথা *জাগরী*র 'রাজনৈতিক জাগৃতি' উপন্যাসটিকে কালের মাত্রায় উন্নীত করেছে। একদিকে পারিবারিক মানুষের নিজস্ব সংকট, অন্যদিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের সংঘাতে দীর্ণ রাষ্ট্রীয় মানুষের বিভ্রান্তি– এ দুয়ের টানাপড়েনে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রবাহে ভাসমান একটি পরিবারের চার সদস্যের 'গোপন আমি'র আবরণ উন্মোচিত হয়েছে উপন্যাসটিতে। এই উন্মোচন-ই *জাগরী*র কথা ও কাহিনি– যার বাতাবরণ সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের তরঙ্গবিক্ষোভ। ব্যক্তি সতীনাথ কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রচারক ছিলেন না। সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ঔপন্যাসিক নির্মাণ করেছেন *জাগরী*র বিষয়বস্তু ও চরিত্র– যেখানে অতীত ও বর্তমানের খণ্ড মুহূর্তগুলি অনুপুঙ্খ ভাবানুষঙ্গে সমগ্র রূপ লাভ করেছে। 'রাষ্ট্রীয় পরিবার'টির প্রত্যেক সদস্য আত্মমগ্ন চেতনাস্রোতে সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনগুলির মূল্যায়ন করেছে। *জাগরী*তে একটি পরিবারের সদস্যদের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সমস্যা বিধৃত হলেও, বৃহত্তর জীবনের প্রেক্ষাপটে তা মানবাত্মার প্রতিনিধিত্ব করেছে। আলোচিত পরিবারটির সকলেই দুঃসহ বেদনায় জর্জরিত হলেও তারা নিঃশেষ হয়ে যায়নি। সব মিলিয়ে জীবনাদর্শের দৃঢ়তা চরিত্রগুলোকে ব্যক্তিগত দুর্বলতার ঊর্ধ্বে এক বৃহত্তর বোধে জাগিয়ে তুলেছে। *জাগরী*র চরিত্রগুলি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের মুক্তিকামী নিরলস কর্মী। তারা সারাজীবন কর্মের সাধনায় আত্মনিয়োগ করে কারাবরণ করেছে। রাজনৈতিক আদর্শের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের এই বাতাবরণ চরিত্রগুলোর ভাবনাকেও প্রভাবিত করেছে। *জাগরী* ব্যক্তি মানুষের জেগে থাকা আর ভারতবর্ষের জেগে ওঠার প্রসঙ্গটিকে ব্যঞ্জিত করেছে। এ জাগরণ একই সঙ্গে ব্যক্তির ও ভারতবর্ষের জাগরণ। একটি চূড়ান্ত মুহূর্তের ওপর ভিত্তি করে চেতনার তরঙ্গ প্রবাহিত হয়েছে। এই উপন্যাসে আন্দোলনের ফল কিংবা জাতীয় জীবনে তার প্রভাব দেখানো হয়নি। ভারতবর্ষের অসংখ্য আত্মোৎসর্গকারী স্বাধীনতাকামীর মতো বিলুও হয়তো একটি নাম মাত্র হয়ে থাকবে। বিলুর মানবীয় দ্বন্দ্ব, নীলুর দ্বিধা, বাবার অসহায়ত্ব, মায়ের করুণ আর্তিকে তিনি পৌঁছে দিয়েছেন নতুন চেতনার স্তরে। যেখানে সীমাবদ্ধ রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে মানবিক সঙ্কট ও সঙ্কটমোচনের প্রচেষ্টায় সামষ্টিক সত্তার জাগরণ ঘটেছে।

জাগরী উপন্যাসে চারটি চরিত্রের মানসিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের বহুমাত্রিক বাস্তবতার চিত্র রূপায়ণ করেছেন সতীনাথ ভাদুড়ী। এই চরিত্রগুলি রাজনৈতিক দলের আদর্শের প্রকাশক হলেও মুখপাত্র নয়। নীলু তার দাদার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে নিজের সঙ্গে লড়াই করেছে। দাদা বিলুও বর্তমান রাজনীতির সঙ্গে নিজের আদর্শের মেলবন্ধন ঘটাতে পারেনি। সমগ্র উপন্যাসে এই চরিত্রগুলো রাজনৈতিক পরিচয় হারিয়ে ব্যক্তি হয়ে উঠেছে, পরিবারের একজন হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক প্রবাহে ভাসলেও চরিত্রগুলি আবর্তিত হয়েছে পরিবারকে কেন্দ্র করে। রাজনীতির লৌহগরাদের অন্তরালে অন্তহীন উৎকণ্ঠায় বিনিদ্র রাত্রিযাপন করেছে নিঃসঙ্গ মানবহৃদয়। তাদের আদর্শ ও কর্মপন্থা ভিন্ন, কিন্তু পারিবারিক অনুভূতিতে তারা অবিচ্ছেদ্য। জীবনের বৃহত্তর আবেদনে *জাগরী* তাই

রাজনৈতিক উপন্যাস হলেও আখ্যানের কেন্দ্রে রয়েছে বাঙালির পারিবারিক জীবন। আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিতে মানুষ, সময় ও সমাজের মিথস্ক্রিয়ায় কেবল সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, *জাগরী* উপন্যাসে মানবতার বার্তাও পরিবেশিত হয়েছে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. নির্মলকুমার বসু, *বিয়াল্লিশের বাংলা* (কলকাতা : কারিগর, ২০১২), পৃ. ৩৯০
২. সতীনাথ ভাদুড়ী, শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত, *সতীনাথ রচনাবলী ১* (কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৪১৮),পৃ. ১৪৭
৩. অমলেশ ত্রিপাঠী, *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস* (কলকাতা : আনন্দ, ১৪০৯), পৃ. ৩৩৩
৪. গোপাল হালদার, 'জীবনশিল্পী সতীনাথ', *সতীনাথ ভাদুড়ী : স্বাতন্ত্র্যের সন্ধান* (কলকাতা : জলার্ক, ১৩৯৪), পৃ. ৪
৫. সতীনাথ ভাদুড়ী, *সতীনাথ রচনাবলী ১*, পূর্বোক্ত,পৃ. ১৫
৬. সতীনাথ ভাদুড়ী, *জাগরী* (কলকাতা : প্রকাশ ভবন, ১৪২১), পৃ.৫
৭. চন্দন ভট্টাচার্য, *সতীনাথ ভাদুড়ীর জাগরী : স্মরণে ও মননে* (কলকাতা : বামা পুস্তকালয়, ২০১৩), পৃ. ৯১
৮. সতীনাথ ভাদুড়ী, *সতীনাথ রচনাবলী ১*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮
৯. তদেব, পৃ. ৬২
১০. ফণীশ্বরনাথ রেণু, 'ভাদুড়ীজী', *সতীনাথ স্মরণে*, সম্পাদক সুবল গঙ্গোপাধ্যায় (কলকাতা:প্রকাশ ভবন, ২০১৩), পৃ.৬২
১১. সতীনাথ ভাদুড়ী, *সতীনাথ রচনাবলী ১*, পূর্বোক্ত,পৃ. ৩৬
১২. তদেব, পৃ. ৪১
১৩. তদেব, পৃ. ৪
১৪. তদেব, পৃ. ৫৩
১৫. নাজমা জেসমিন চৌধুরী, *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮০), পৃ. ১৮৬
১৬. সতীনাথ ভাদুড়ী, *সতীনাথ রচনাবলী ১*, পূর্বোক্ত,পৃ. ১১৬
১৭. তদেব, পৃ. ৫৫
১৮. তদেব, পৃ. ৭
১৯. তদেব, পৃ. ১০৫
২০. তদেব, পৃ. ৮৬
২১. তদেব, পৃ. ১১৭
২২. তদেব, পৃ. ১০৫
২৩. তদেব, পৃ. ৭
২৪. তদেব, পৃ. ১৩৭
২৫. তদেব, পৃ. ১৪৬
২৬. তদেব।
২৭. তদেব, পৃ. ১৪৪
২৮. তদেব, পৃ. ১৩৪